International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 68-77
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

প্রাচীন ‘খেন’ জনগোষ্ঠী : তাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা

Zinatun Nesa
Researcher, Faculty of Humanity, Begum Rokeya University, Rangpur, Bangladesh

Abstract

The Khen were the important traibal people in North-Bengal of India and Bangladesh like to the ‘Coch’ ‘Mech’ and ‘Tharu’. We are well known about the Rajbansis, Mech and Coch people but we have not sufficient evidences regarding origin, migration and habitation of the Khen community. We have information’s only about Khen kings and their administration, their religious and archaeological activities. History almost silent about its common people. In North-Bengal of India (Cochbihar District) and Bangladesh (District of Rangpur and Dinajpur) Khen is a remarkable schedule caste till today. We conducted a short socio-economic survey on common khen people in this article. Our survey mostly based on kurigran district of Rangpur in Bangladesh just opposite the Indian border of Dinhata sub-division of Cochbihar district. We also used secondary data collected from Indian sources. We found an overall situation of the khen people as like there origin, migration, dynasty, present social status, their racial identification, professions, their everyday life, rituals, customs etc. in this article. We found that, at present the khen are not an Indigenous group of people, not a tribal one, even they are not like traditional local Bengali people. Their social trends, rituals, customs, religion and beliefs almost similar with Rajbansi traditions, although they have clearly separate racial identity. The khens are gradually changing and developing their overall socio-economic conditions. We are sure that, there will not be any differences between Rajbansi and Khen People in near future.

Article DOI: 10.29032/IJHSSS.v4.i3.2017.1-10

উৎস সন্ধানে: ‘খেন’ বা ‘ক্ষেন’ নামটির জাতিগত উৎস সম্পর্কে বিপরীতধর্মী নানা তথ্য প্রচলিত আছে। অহোম্ ভাষায় ‘Khun’ বা ‘Khen’ নামে সমার্থবাচক শব্দ প্রচলিত আছে, যার অর্থ-রাজা, বৃহৎ, উত্তম ইত্যাদি। ‘অহম বুরুঞ্জি’ গ্রন্থে ‘খেন কামতা’ ‘খেন কামতেশ্বর’ ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এই ‘খুন’ বা ‘খেন’ শব্দ থেকে খেন জনগোষ্ঠীর নামকরণ হওয়ার সম্ভাবনা [১]। কোন কোন সূত্রানুযায়ী ভূঁইয়া শ্রেণীর ‘খান’ (অপভ্রংশ খেন) উপাধিধারী রাজাদের নামানুসারে জাতিগত ‘খেন’ শব্দটি গৃহীত হয়েছে[২]। ‘কামরূপ বুরুঞ্জী’র বিবরণ অনুসারে খেনবংশীয় প্রথম রাজা নীলধ্বজ ছিলেন কোচবংশীয়। ক্ষত্রীয় রাজার ঔরসে বেশ্যার (নটীর) গর্ভস্থ সন্তান ছিলেন বলে ‘খেন’ নামকরণ[৩]। অন্য একটি মতে ‘The khen or kanteswar Nildhwaj was of a mixed identity `Kh’ of kshatriya and `n’ of `Nati’ (fallen woman) [4] বৃটিশ শাসক ও পন্ডিত Montgomerj Martin -এর মতে- খেনরা নিজেদের ক্ষত্রীয় ও রাজবংশীয় পরিচয় দিতে পছন্দ করে। তবে রাজবংশীরা রাজা নীলধ্বজকে তাদের জাতিভুক্ত স্বীকার করে নিলেও সাধারণ

খেন জনগোষ্ঠীকে রাজবংশী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় নি। তারা মনে করত, সাধারণ খেনজনেরা রাজার দাস মাত্র-যারা ক্ষত্রীয় গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত[৫]। খেন বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ কামতেশ্বর এবং কামতারাজ্যের পারিবারিক বিগ্রহ 'কামদা' বা 'গোসানী' দেবীকে 'কামতেশ্বরী' নামকরণ করেন এবং তার 'খেন' বংশকে 'শূদ্র' পর্যায় থেকে উন্নীত করে খাঁটি হিন্দু বংশের অন্তর্ভুক্ত করেন[৬]।

পূর্বে 'খেন'দের শূদ্র পর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হতো। আসামে এরা 'কোলিতা' নামে পরিচিত। বর্তমানে নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং 'নবশাখ' গোত্রের পৌরহিত্যকারী ব্রাহ্মণরাই এদেরও পৌরহিত্য করেন। ড. বুকানন হেমিলটনের মতে, খেনরাই একমাত্র কামরূপী গোত্রের লোক। ব্রাহ্মণেরা তাদের আসল শূদ্র বলে স্বীকার করতো। ঔ অ ঠধং এর মতে-পূর্বে এদের প্রধান পেশা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধীনে কৃষি ও গৃহস্থালী কাজকর্ম[৭]।

বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুর জেলার খেনদের কেউ কেউ মনে করেন, তারা সেন রাজা বল্লাল সেনের উত্তরপুরুষ এবং 'সেন' থেকে 'খেন' উপাধি গ্রহণ করেছেন[৮]। বাংলাদেশের বেশিরভাগ 'খেন' উপাধিধারী ব্যক্তি নিজেদের 'খেন পরিচয় বজায় রেখেও রাজবংশীয় ক্ষত্রীয় বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক আচার-নিষ্ঠায়, ধর্মাচরণে রাজবংশী জনজাতির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নিয়ম-কানুনই অনুসৃত হয়।

'খেন' জনজাতির উৎস প্রসঙ্গে আরেকটি মত হচ্ছে- তারা প্রাক্-অহোম জনগোষ্ঠীর একটি বিচ্ছিন্ন শাখা। গারো-পাহাড় অঞ্চল দিয়ে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে খেনরা কোচবিহার-রংপুর জেলার ধরলা নদীর তীরে তীরে গড়ে তুলেছে স্থায়ী বসতি। এরা ছিল যোদ্ধা জাতি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নীলধ্বজের নেতৃত্বে খেনরা কামতারাজ্যের পত্তন করে[৯]। ড. বি চক্রবর্তী তাঁর 'A Cultural History of Bhutan' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, খেন জাতির লোকেরা ভুটানের খেন প্রদেশে বসবাস করতো। তিব্বতীদের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। তাঁর মতে খেন জাতির লোকেরা এ অঞ্চলে এসেছিলো ভুটান থেকে[১০]। পক্ষান্তরে, বৃটিশ প্রশাসক ও মানববিজ্ঞানী মার্টিন মনে করেন- খেনরা ত্রিপুরার পর্বতসংকুল অঞ্চলের অধিবাসী ছিল[১১]। সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এই সমতলভূমিতে। উইলিয়াম হান্টার খেনদের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন রাজবংশীদের। তিনি তাঁর প্রণীত ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে রাজবংশী জনদের পরেই স্থান দিয়েছেন খেনদের। তাঁর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে সময় রংপুর জেলার আয়তন ছিল ৩,৪৭৬ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ২১,৪৯,৯৭২ জন। এর মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যা ৩,৯৯,৪০৭ জন এবং খেন সংখ্যা ২০,০১৩ জন [১২]।

বাংলাদেশে খেন জনজাতির সংখ্যাতাত্ত্বিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। তবে কুড়িগ্রাম জেলার শিক্ষিত খেন ব্যক্তিদের মতে, বর্তমানে (২০১৩) বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলায় প্রায় ২০ হাজার খেন জনজাতি বসবাস করেন[১৩]। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ড. বুকানন হেমিলটন রংপুরে এসে বহু খেন পরিবার দেখেছিলেন। আবার ঐ শতকের শেষ দিকে উইলিয়াম হান্টার মাত্র হাজার খানিক 'খেন' দেখতে পান। এ সংখ্যা পরবর্তীকালে ক্রমনিম্নগামী। পদবী ও জাতিত্ব পরিবর্তন এর মূল কারণ হতে পারে [১৪]। অপর গবেষক রতন বিশ্বাস কোচবিহারে ৭ হাজার খেন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা বলেছেন [১৫]।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়:

খেনরা রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা দাবি করলেও নৃতাত্ত্বিক বিচারে মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রচলিত ধারণা, এদের আবয়বিক সাদৃশ্য রাজংশীজনদের সাথে। রাজবংশীদের নৃতাত্ত্বিক সম্পৃক্ততা অনেকাংশে মঙ্গোলয়েড জনদের সাথে। তবে তাদের গায়ের রং সর্বত্র পীত নয়। চুল সোজা, চোখ খানিকটে বাদামি ও গোল। নাক চ্যাপ্টা, চোখের পাতা অবনমিত। গায়ে পশমের স্বল্পতা। উচ্চতা সাধারণভাবে পাঁচ ফুটের সামান্য কম বা বেশি। মুখ গোলকার। সামগ্রিকভাবে সুশ্রী। কিন্তু বাংলাদেশের খেনদের আবয়বিক বৈশিষ্ট্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে রাজবংশীদের সমতুল্য হলেও প্রকৃতপক্ষে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপাতে অনেক বেশি স্বতন্ত্র। এদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রোট অস্ট্রালয়েড জনদের সাথেই অধিকতর সাদৃশ্যময়।

প্রোটঅস্ট্রালয়েড জনদের দেহাকৃতি খর্বকায় থেকে মাঝারি। মাথার খুলি লম্বা থেকে মধ্যমাকৃতি। নাক চওড়া ও চ্যাপটা। গায়ের রং কালো। মাথার চুল ঢেউ খেলানো[১৬]। বর্তমানে খেনদের দেহাবয়বে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যই বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আবার, কালো গায়ের রং, খর্বাকৃতি দেহবৈশিষ্ট্য, দীর্ঘাকৃতির মাথার খুলি, ডিম্বাকৃতির মুখমন্ডল, ক্ষুদ্র ও অবদমিত নাক, ক্ষেত্র বিশেষে সোজা ও কোঁকড়ানো মাথার চুল, গায়ে লোমের স্বল্পতা[১৭] ইত্যাদি কোচদের দেহ বৈশিষ্ট্যর সাথেও খেনদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি, বোড়ো জনগোষ্ঠীর কোচ-মেচ জনদের সাথে খেনদের আবয়বিক সাদৃশ্য সর্বাধিক। খেন ও মেচ উভয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য বসবাস ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যে। প্রা প্রাগজ্যোতিষপুর হিন্দুরাজ্য। বিভিন্ন সময় এ রাজ্য শাসন করেছিলো নরক, পাল, চুতিয়া ও খেন রাজবংশ। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা শুরু হয় কামতা বা কোচবিহার রাজ্যের। নতুন কামতা রাজ্যের মাতৃকূল কোচ এবং পিতৃকূল মেচ। কোচ ও মেচ জনগোষ্ঠীর রক্তের মিশ্রণ ও সংকরায়ন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি মাইলস্টোন। ভারতীয় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এবং তরাই ও ডুয়ার্স এর বিভিন্ন অঞ্চলে মেচরা বসবাস করে। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমাতে বেশ কিছু মেচ এখন 'মোদক' নামে পরিচিত। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমায় অনেকেই পদবি পাল্টে 'মন্ডল' ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে প্রকৃতি উপাসক বহুসংখ্যক মেচ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে রাজবংশী পরিচয় দিচ্ছেন।[১৮] দিনহাটা মহকুমার বিপরীতে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলাতেও বহুসংখ্যক রাজবংশী, মেচ ও খেন জনজাতির বসতি রয়েছে। এ অঞ্চলের খেনদের অনেকের পদবি 'মোদক', 'মন্ডল', 'খেন', 'সরকার', 'কুন্ডু', 'দাস', 'রায়', 'বর্মণ ইত্যাদি। এদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ কোচবিহার রাজদরবারের সাথে ছিলো- এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। প্রশাসনিক কাজের সাথে জড়িত উপাধির মধ্যে রয়েছে 'প্রামাণিক' 'পত্রনবিশ' 'সরকার' 'খন্দকার' 'চৌধুরী' ইত্যাদি। 'পত্রনবিশ' রাজদরবারের কর্মচারী, 'প্রামাণিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। 'সরকার' জমিদার বা রাজার সেরেস্তার কর্মচারী। এরা রাজস্ব ব্যবস্থায় ম্যানেজার বা তদারককারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সরকার, চৌধুরী, প্রামাণিক উপাধিধারীরা এক কালে ছিলেন প্রতাপশালী। বাংলাদেশে এখনো তারা সম্পদ ও ক্ষমতার পৌরুষ প্রদর্শন করে থাকেন। 'খেন'দের মধ্যে যারা মুসলিম, তাদের পদবি 'নৎস শেখ'। এককালে হয়তো এরা মধ্যম মানের সম্পদশালী ছিলেন কিন্তু বর্তমানে হতদরিদ্র। খেনদের মধ্যে কুড়িগ্রাম অঞ্চলে 'কৈবর্ত' ও 'অধিকারী' উপাধিও ব্যবহার করেন অনেকে।

উপর্যুক্ত সূত্রসমূহ এবং পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে শুরু করে সংলগ্ন বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোচ, মেচ, থারু, রাজবংশী ও খেন জনজাতির বিপুলসংখ্যক মানুষ বসতি করতো। দীর্ঘদিন পাশাপাশি অবস্থান রক্তবর্গে ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যে নিয়ে আসে সাদৃশ্য। বোড়ো, কোচ ও মেচদের অনুরূপ খেনরাও আগমন করে প্রাগ্-জ্যোতিষপুর অঞ্চল থেকে এবং ষোড়শ শতক থেকে কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ভূখ-ে। খেনদের দেহাবয়বে বোড়ো, কোচ ও মেচদের সংমিশ্রণ ও সাদৃশ্য সর্বাধিক। সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার, লোকবিশ্বাস এবং পালা-পার্বণে ও ধর্মাচরণে খেনরা বোড়ো (রাজবংশী), কোচ ও মেচদেরই নিকটাত্মীয়। সুতরাং খেনদের উৎস প্রাগ্-জ্যোতিষপুর অভিমুখী-একথা দৃঢ় ভাবেই দাবি করা যায়।

খেন রাজবংশ:

প্রাগ্-জ্যোতিষপুর ও কামরূপ কামতা রাজ্যের ভৌগোলিক পরিসীমায় কোচ, রাজবংশী ও খেন জনগোষ্ঠীর বসবাস প্রাচীনকাল থেকে। 'যোগিনীতন্ত্রের' মতে এ অঞ্চলের আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ৮০০ মাইল এবং প্রস্থ ২৪০ মাইল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কোচবিহার ও আসামের কামরূপ, জলপাইগুড়ি, রংপুর জেলা, দার্জিলিং এর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, ময়মনসিংহের বৃহত্তম অংশ, আসামের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল এবং কাছাড় ও জয়ন্তীয়া এবং গারো পাহাড় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল[১৯]। ষোড়শ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এ ভূখন্ডটি প্রধানত তিনটি রাজবংশের দ্বারা শাসিত হয়েছে- নরক রাজবংশ, পাল রাজবংশ ও খেন রাজবংশ।

প্রামাণ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে মহারাজা ভাস্করবর্মাই কামরূপের প্রথম প্রখ্যাত নৃপতি। তিনি ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং উভয়ে মিলে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন [২০]।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল নৃপতিদের শাসনের পর ত্রয়োদশ শতকের কামরূপের ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট। সে সময় বার ভূঁইয়ারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করে এদেশ শাসন করেন। খুব সম্ভবত রাজা দুর্গতনারায়ণের কাল থেকেই পশ্চিম কামরূপের নাম হয় কামতারাজ্য। রাজ্যের নৃপতি পরিচিত হন 'কামতেশ্বর' নামে [২১]।

এরপর পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস আবারো কুয়াশাচ্ছন্ন। পঞ্চদশ শতকের মধ্যপর্ব (১৪৪০) থেকে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক কামরূপ-কামতা অধিকারের (১৪৯৮) কাল পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন খেন বংশীয় রাজাগণ [২২]।

রাজা নীলধ্বজ (১৪৪০-১৪৬০ খ্রি.) খেন বংশের প্রথম শাসক। তিনি সম্ভবত ছিলেন একজন ভূঁইয়া-প্রধান এবং তাঁর উপাধি ছিল খেন বা খান। তিনি ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে কামতা রাজ্য অধিকার করেন [২৩]। নীলধ্বজের রাজ্যলাভ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন মতে, তিনি হবুচন্দ্রের উত্তরাধিকারী পাল রাজার রাজ্য জয় করেছিলেন। অন্য মতে, কামরূপের জনৈক পালবংশীয় রাজাকে পরাজিত করে নীলধ্বজ রাজ্য লাভ করেন এবং গৌহাটি থেকে রাজধানী নিয়ে আসেন গোসানীমারী বা কামতাপুরে। রাজা নীলধ্বজ মিথিলা থেকে অনেক ব্রাহ্মণকে কামতাপুর রাজ্যে বসবাসের সুযোগ করে দেন। তিনি তাঁর খেন বংশকে নিম্ন পর্যায় থেকে খাঁটি হিন্দু বংশে উত্তরণ ঘটান [২৮]।

খেন রাজাদের রাজধানী প্রাচীন কামতাপুর কোচবিহার শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দিনহাটা রেলস্টেশন থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে খলিসা গোঁসানীমারী গ্রামে কামতাপুর দূর্গনগরী অবস্থিত। এক সময় এখান থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের শাসন প্রবাহ পরিচালিত হতো। কামতা রাজ্যের সীমানা ছিল পশ্চিমের করতোয়া নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও উত্তরের ভুটান থেকে দক্ষিণের বগুড়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। কামতাপুর উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দুর্গ। পূর্বে ধরলা নদী থেকে পশ্চিমে বড় গোদাই খোড়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এ দুর্গের সীমা। উত্তর-দক্ষিণে যথাক্রমে শীতলাবাস থেকে শিলদুয়ার-সোয়ারীগঞ্জ পর্যন্ত এর সীমানা। দুর্গটির বাইরে রয়েছে গভীর পরিখা। বর্তমানে এটি একটি বিধ্বস্ত পুরাকীর্তি। দুর্গটিতে মোট সাতটি প্রবেশ-দ্বার ছিল বলে অনুমিত হয়। যথা: শিলদুয়ার, বাঘদুয়ার, সন্ন্যাসীদুয়ার, জয়দুয়ার, নিমাইদুয়ার ও হোকোদুয়ার। 'হেকো' নামে একজন খেন বা কোচ বীরের নামানুসারে হোকোদুয়ারের নামকরণ হয় বলে বুকানন হেমিলটন জানিয়েছেন। ১৮০৮-১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে হ্যামিলটন দুর্গটি পরিদর্শন করেন। তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপথ ও সেতুর ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন। রাজা নীলাম্বরের তৈরি 'নীলাম্বর সড়কের' কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। রাজা নীলধ্বজ দুর্গমধ্যে ঐতিহাসিক 'কামতেশ্বরী মন্দিরটি' প্রতিষ্ঠা করেন [২৯]।

নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ খেন বংশের দ্বিতীয় রাজা। তিনি ১৪৬০ সাল থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কামতাপুরের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকালে গৌড়ে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও গোলযোগের কারণে কামরূপ-কামতার রাজন্যবর্গ গৌড়ের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থেকে নিজেদের অবস্থা সুসংহত করার সুযোগ পান [৩০]। তৃতীয় খেন রাজা চক্রধ্বজের পুত্র নীলাম্বর ১৪৮০ সালে কামতারাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। খেন রাজবংশের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। নীলাম্বর কামরূপের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে মৎস্যদেশ (করতোয়া নদীর পূর্ব সীমা থেকে) পূর্বে আসামের বরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রায় সমগ্র রংপুর জেলা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি রাজধানী কামতাপুর থেকে রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত অনেকগুলো প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করে এক দিকে যেমন জনসাধারণের যোগাযোগের সুব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি সুরক্ষিত করেছিলেন রাজ্যের নিরাপত্তা। দু'টি সড়ক এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-'নীলাম্বরী' সড়ক ও 'দর্পার মাল্লি'। সড়ক দুটো কামতাপুর দুর্গ থেকে বেরিয়ে রংপুর জেলা পরিক্রমার মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুলতান ও ফৌজদারদের আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের কাছে মন্থনা কোট, সাতগাড়ার দুর্গ নির্মাণ করেন [৩৩]।

রাজ্যকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশে রাজা নীলাম্বর রংপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সেগুলো হচ্ছে-গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ছয়ঘর, হারাগাছের ধুমগড়, পীরগঞ্জের চতরা, সুন্দরপুর, হাতিবান্ধা, ফতেপুর, পীরগঞ্জের কাঁটাদুয়ার, নীলাম্বরের প্রাসাদ প্রভৃতি। দুর্গ ছাড়াও চতরায় নির্মাণ করা হয় একটি সুদৃশ্য ও সুবিশাল রাজপ্রাসাদ। রাজবাড়িটিকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশে এর চারদিকে খনন করা হয় বিশাল পরিখা। পরিখার বিস্তৃত জলাধার 'নীল দরিয়া' নামে পরিচিত। 'দরিয়ার বিল' নামেও একে অভিহিত করা হয়। রাজবাড়ি, পরিখা ও প্রাচীরগুলোর ধ্বংসাবেশেষ রয়েছে এখনো ৩৪। রাজা নীলাম্বরের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার পাঙ্গায় একটি শিবমন্দির।

বাংলাদেশের খেনদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি:

সমাজ:

ভারতীয় কোচবিহার-জলপাইগুড়ির খেনদের সাথে সংলগ্ন বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম-রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের খেনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিত অভিন্নÑএ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় বহু খেন ভারতীয় কোচবিহার জেলার সীমান্ত পেরিয়ে যেমন বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট জেলার সীমান্ত অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছে, তেমনি এ অঞ্চলেরও বহু খেন সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে কোচবিহার অঞ্চলে। দেশবিভাগ জনিত দেশান্তর গমন খেনদের শ্রেণীগত ও সামাজিক পরিচয়কে প্রভাবিত করেছে প্রবলভাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ অঞ্চলে পূর্বেও পত্রনবিশ, খন্দকার, প্রামাণিক, চৌধুরী ইত্যাদি পদবী-যা অপেক্ষাকৃত

বিত্তশালী শ্রেণীর খেন ধারণ করতেন - খুব একটা দেখা যায় না। এমনকি, মুসলিম খেন (নৎস শেখ) পদবীও খুঁজে পাওয়া বিরল ঘটনা।

কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্ত অঞ্চলে 'নো ম্যানস্ ল্যান্ডের' ভেতরে (শুকানুর কুটি, দিনহাটা) যেসব ভারতীয় খেন বসবাস করেন, তাদের মধ্যে 'পত্রনবিশ' উপাধিধারী খেন দেখা গেছে। বাংলাদেশ ভূখন্ডে এ ধরনের উপাধি অনুপস্থিত। কুড়িগ্রামের প্রতুলচন্দ্র প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেশ বিভাগ-পূর্বকালে (বৃটিশ শাসনামলে) খেনরা 'সেন কায়স্থ' উপাধি লিখতেন। তার নিকট সংরক্ষিত জমির দলিলে 'জাতি' পরিচয়ের স্থানে লেখা আছে সেন কায়স্থ'। খেনদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর গ্রামের কাশীপুর মৌজার সমাজকর্মী, ৬২ বছর বয়সী স্কুল শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ৬০ বছর বয়সী শ্রী খগেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ ৩৮। তাদের দুজনের উপাধি 'সেন' ও 'সরকার'। খেনদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, তাদের মধ্যে ধর্মাচার, লোকাচার, সামাজিকতা সব বিছুই রাজবংশী-ক্ষত্রীয় সমাজের অনুসৃতি হলেও 'রাজবংশী' কথাটা প্রচলিত নেই। তারা নিজেদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'খেন' 'সেন' দু'রকম পরিচয়ই দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে বর্তমানে খেনদের মধ্যে সেন, সরকার, রায়, বর্মণ ও মন্ডল উপাধিগুলোই ব্যবহার করা হয়, অন্যগুলোর প্রচলন নেই বললেও চলে। খেনরা নিজেদের রাজবংশীদের সাথে একত্মতা অনুভব করলেও রাজবংশীরা খেনদের নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না।

খেনদের সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব কোনো সাংগঠনিক কাঠামো নেই, নেই স্বতন্ত্র শাসন প্রক্রিয়া। নিজেদের মধ্যে বিবাদ, বিরোধ, জমিজমা সংক্রান্ত ঝামেলা, শালিস-মীমাংসা সব কিছু ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। স্থানীয়ভাবে সমাধা না হলে অনেকে আশ্রয় নেয় আদালতের। তবে খেনদের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়ায় জড়ানোর দৃষ্টান্ত খুব নগণ্য। তারা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভালবাসে। এরা পিতৃপ্রধান পরিবার। পূর্বের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারে পরিণত হয়েছে। তবে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে এখনো খেন পরিবারে আশ্রয় দেয়া হয়। রাজনীতি চর্চায় ও সমর্থনে খেনরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে না। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে থাকে সক্রিয় অংশগ্রহণ। কখনো মেম্বার পদে নির্বাচিতও হন।

খেন জনজাতি স্থানীয় অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় পশ্চাৎপদ। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের অনগ্রসরতা লক্ষণীয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উপবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় খেনদের মধ্যেও শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি হিসাব মতে দেশে বর্তমান শিক্ষার হার ৬০ শতাংশের ওপরে। প্রাইমারি শিক্ষিতের হার মোটামুটি ৯০ শতাংশ। খেনরাও এই পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। এদের মাঝে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখার হার প্রায় ৪০ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে এ সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পায়। তবে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি গ্রহণের হার ১০ শতাংশের বেশি নয়। পোস্ট-গ্রাজুয়েট খেন শিক্ষিত জনের সংখ্যা ৩ থেকে ৫ শতাংশ ৩৯। খেন যুবকদের মধ্যে ড্রাগ আসক্তি, নেশা ও অপরাধ প্রবণতা কম

পেশা:

সাধারণভাবে কৃষিকাজই খেনদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কৃষির জন্য প্রয়োজন ভূমি। কিন্তু স্থানীয় অন্যান্য জনদের অনুরূপ খেনদের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিও ক্রমবিলীয়মান। কয়েক দশক পূর্বেও ভূমিহীন খেনদের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। বর্তমানে ভূমিহীনদের হার প্রায় ১০ শতাংশ। আগে কেবল নিজস্ব ভূমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। ফলে অন্যান্য কর্মের প্রতি নির্ভরশীলতা ছিলো। যেমন : মাছ ধরা ও বিক্রয়, শাক-সবজি উৎপাদন, শ্রম বিতরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, গৃহে হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল পালন ও বাজরজাতকরণ ইত্যাদি।

ভূমিহীনতা তাদের মধ্যে এখনো তীব্রভাবে বিদ্যমান কিন্তু সাম্প্রতিক কালে প্রায় প্রতিটি খেন পরিবার কোন না কোন ভাবে বসত ভিটার মালিকানা অর্জন করেছে। চাষাবাদের ব্যাপারে পূর্বে বর্গাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে চাষিরা বর্গা নেয়ার চাইতে জমি বর্গা দিতেই বেশি আগ্রহী। কেননা, এখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যয়ভার অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই, ফসল চাষে বর্গাগ্রহীতারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেবল জমি চাষ করে বর্তমানে কোনো খেন পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়, মাছ ধরা, পশু-পালন, সবজি চাষ, কৃষি শ্রমিক ইত্যাদিতে নিয়োজিত হয়। কুড়িগ্রাম অঞ্চলে অনেক খেন যুবক মটর বাইক ভাড়া দিয়ে উপার্জন করে। মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ যুবকেরা রিক্সা-ভ্যান চালিয়ে থাকে। তবে পোল্ট্রি ফার্ম ও মৎস্য চাষের মতো কাজে খেনরা জড়িত হয়নি। অতি সম্প্রতি অনেক খেন যুবক বিদেশে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যায় । যারা গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট-গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করে, তাদের মধ্যে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্ম সংস্থান না হলে ঔষধ কোম্পানি বা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। অতি নগণ্য সংখ্যক খেন প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, সাম্প্রতিককালে খেন জনদের বেকারত্বের অবস্থা স্থিতিশীল, বলা যায় খারাপ নয়। বিশেষত, এনজিও-দের কর্মসূচিতে প্রায় সকল খেন জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করায় দারিদ্র্য

ও আর্থিক অনিশ্চয়তা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, খেনদের প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহ সচল থাকলেও সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায়।

নারীরা বর্তমানে ব্যাপক হারে এনজিওদের সহযোগিতায় উপার্জনে নিয়োজিত আছে। এনজিওদের টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে নারী। সংগঠন তৈরি করে নারীদের মাধ্যমেই ঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচি চলে। পারিবারিক সঞ্চয় বলতে বোঝায় নারীদের সঞ্চয়। খেন নারী-পুরুষ স্বীকার করেছেন যে, 'ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি' তাদের জীবন প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীরা এখন আর পুরুষ খেনদের গলগ্রহ নয় সহগামী ও সহকর্মী। কন্যা সন্তান খেন সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করা হয় না। নারীরা এখন তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়, যেমন নয় আদিবাসী সমাজে। তাদের সমাজে অনেকটাই মর্যাদা অর্জন করেছেন তারা।

বস্তুত, অর্থনীতির মাপকাঠিতে 'খেন'রা দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম তথা 'দারিদ্র্য' মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। আদিবাসী-উপজাতি 'লেবেল' বলতে আমরা যা বুঝি বংলাদেশের বর্তমান 'খেন'দের সর্ম্পকে সে কথা বলা যায় না।

আচার প্রথা:

উত্তরাধিকার সূত্রে মেনে চলা আচার অনুষ্ঠানসমূহ খেনরা যথারীতি পালন করে। জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যু মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চক্র। জীবনের এসব গুরুত্বপূর্ণ স্তর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আনন্দ-বেদনায় এবং আচার-নিষ্ঠায় পালন করে থাকে খেন জনজাতি। গর্ভবতী মেয়েরা খেন সমাজে আলাদা যত্ন লাভ করে থাকে। গর্ভাবস্থায় তাদের সিঁদুর তুলে নেয়া হয়। সাধভক্ষণ ও সীমন্তয়ন আচারগুলো অনুসৃত হয়। বর্তমানে সন্তান জন্মের জন্য হেলথ্ সেন্টার বা উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হলেও সীমিত পর্যায়ে আঁতুড় ঘরে সন্তান জন্মের ব্যাপারটা এখনো প্রচলিত রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সকল নিয়ম মেনে চলা হয় না। কাটছাট করে সংক্ষিপ্ত করে আনা হয় প্রথা ও সময় কাল। সন্তানের জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, ষোলমাতৃকা, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, চূড়াকরণ (১৮ মাসের মধ্যে) মস্তক মুন্ডন (দাঁত ওঠার আগে) ইত্যাদি আচারগুলো গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়।

বিবাহ মানুষের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কিছু সামাজিক আচার-প্রথাও পালিত হয় খেন সমাজে। হলুদ অনুষ্ঠান, কন্যাদান, পুরোহিতের অংশগ্রহণ, জামাইবরণ, আগুনের প্রদীপ নিয়ে শপথ গ্রহণ, সূর্যের দিকে মুখ করে সূর্যকে সাক্ষী মানা, বউভাত এসব আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে খেন নারী পুরুষ। উল্লেখ্য, খেনদের বিবাহে জাত, শ্রেণী, গোত্র মানা হয়। রাজবংশীদের সাথে খেনদের বিবাহ হতো না কিন্তু বর্তমানে রাজবংশী-খেন বিবাহ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত।

মৃত ব্যক্তিদের আচার-প্রথাগুলো পালিত হয় রাজবংশী-ক্ষত্রীয় ও হিন্দুধর্মের রেওয়াজ অনুযায়ী। মৃত ব্যক্তিকে প্রথমেই নেয়া হয় তুলশী তলায়-উত্তরমুখী হয়ে স্নান করানোর জন্য। তুলশী পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় দু'চোখ। স্নানান্তে মৃতদেহকে নতুন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। এরপর শোয়ানো হয় বাঁশের খাটিয়ায়। গায়ে মাখানো হয় কাঁচা হলুদ মেশানো সর্ষের তেল। চন্দন মাখানো হয় লাশের ললাটে। নিকটাত্মীয় ও শুভাকাক্সক্ষীরা অতঃপর খোল করতাল ও হরিনাম সহযোগে লাশ নিয়ে যায় শ্মশানে। শ্মশানের আনুষ্ঠানিকতাও অজস্র প্রকার।

এরপর অশৌচ পালন, ব্রক্ষ্মাচর্য পালন। সেলাইবিহীন একবস্ত্র পরিধান। পাদুকাবিহীন পায়ে হাঁটাচলা, তৈলবিহীন একসিদ্ধঅন্ন গ্রহণ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। খেন সমাজে অশৌচ পালন করা হতো শূদ্রদের অনুরূপ ৩০ দিন। বর্তমানে কমিয়ে তা করা হয় ১২ দিন।

খেনদের সমাজে ধর্মীয় ও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক কিছু অনুষ্ঠানও পালন করা হয়। তারা ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে পালন করে জন্মাষ্টমী ব্রত। করে বাসন্তী ও চৈতীপূজা। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় দুর্গা পূজা এবং চার দিন পর লক্ষ্মী পূজা, কার্তিকের অমাবস্যায় দীপান্বিতা পূজা (কালীপূজা) ঘটা করে উদযাপন করে। শান্তি-স্বৈস্তয়ন, বাস্তপূজা, হোম-যজ্ঞ, আহ্নিক, গুরুমন্ত্র ইত্যাদি পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বলাবাহুল্য, এসব আচার ও পূজানুষ্ঠান অভিনব বা স্বতন্ত্র কিছু নয়Ñরাজবংশী ও হিন্দুসমাজেও প্রচলন আছে এসবের। প্রত্যেক খেন বাড়িতে তুলশি তলা ও বাস্তুদেবতার ঘর দেখা যায়। 'শীতলা' তাদের জনপ্রিয় দেবী।

পোশাক:

খেনরা অন্যান্য সাধারণ বাঙালির মতোই ধুতি, ফতুয়া, শার্ট, হাফ হাতা গেঞ্জি পরিধান করে থাকে। বর্তমানে প্যান্ট শার্ট, লুঙ্গি বেশি প্রচলিত। কয়েক দশক পূর্বে কোচদের মতো এদের নারীরা বুক পর্যন্ত এক বস্ত্র 'বুকুনী' বা 'পাটানী' পরিধান করলেও এখন শাড়ি একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র। পুরুষরা পূর্বে প্রচলিত একখ- ক্ষুদ্র বস্ত্র 'নেংটি' আর পরিধান করেন না।

অলংকার, ঘর ও আসবাবপত্র:

অলংকার হিসেবে শাঁখা, সিঁথিপাতি, নাকের স্বর্ণের ফুল, টিকলি, কানপাশা, রূপা, কাঁচ ও দস্তার চুড়ি, রিং, দুল, ছড়, খাড়-, বিছা, গোট প্রভৃতি ব্যবহার করে খেন নারী। বসবাসের জন্য দোচালা ও চার চালা কুঁড়েঘর খেনদের কাছে প্রিয়। বর্তমানে টিনের চালা এবং আধাপাকা টিনের ঘরও তৈরি করা হয়। কিন্তু আসবাবপত্রের বাহুল্য তাদের গৃহে পরিলক্ষিত হয় না। শোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় চারপাই, বাঁশের মাচা। আলনার পরিবর্তে লম্বা টানানো রশি, ছোট ছোট কাঠের আলমিরা, কাঠের চেয়ার, চৌকি ইত্যাদি হচ্ছে গৃহগত আসবাবপত্র। বিছানা খুব সাধারণ কাঁথা ও পাটের তৈরি ধকরা ও পাতলা চাদর। প্রত্যেক খেন পরিবারের শোবার ঘরে কোন না কোন দেবতার ছবি ঝোলানো থাকে।

বিভিন্ন পূজা ও বিনোদন:

খেন সমাজে প্রচলিত পূজা-আচারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাষাণ পূজা, মনসা বা বিষহরি পূজা, চাউনি পূজা, ধামপূজা, কালী-দূর্গা-হাবাংকালী, ভূতকালী, চড়ক পূজা, বাঁশ পূজা, চৈতা ও বাসন্তী পূজা, শিবরাত্রি, শীতলা পূজা, ষষ্ঠী পূজা, সাইটল পূজা, সুবচনী পূজা, মাষাণ পূজা ইত্যাদি।

শীতলা, বাস্তু, সুবচনী ও বিষহরি পূজা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। যে-কোন শুভকামনা বা কল্যাণ প্রত্যাশায় এবং সংসারে সকল প্রকার অশান্তি দূরীকরণের লক্ষে সুবচনী ঠাকুরের পূজা করা হয়। আচারসমূহ পালন করে মূলত মেয়েরা। ঘট ও মূর্তি উভয় পদ্ধতিতে এ পূজা সম্পন্ন করা হয়। গুয়াপাণ সুবচনী পূজার প্রধান উপকরণ। অন্যান্য উপকরণ হচ্ছে কচি কলাপাতা, সিঁদুর, ধান, ঘট, কলার ছড়া, আতপ চাল, পান, তামাক, তেল, চালুন ও পাখা।

সুবচনী ব্রতে গাওয়ার জন্য একটি গীত

স্বর্গ হাতে নামেয়া আসুক
নামোরে মাও কালী
মুই সুন্দরী পূজারে বসাইচুং
নজোর করো আসি।
কলাও দিছু সারি রে সারি
ডিমাও দিছু সারি
স্বর্গ হাতে নামেয়া আসুক
নামোরে ছুবছনি।

এই মন্ত্রে আত্মাবাদ বিষয়টি ধরা পড়েছে। পুত্র ও ধন কামনায় সাইটল পূজা, পারিবারিক কল্যাণ কামনায় বিষহরি পূজা, বিপদ আপদ উত্তরণের জন্য মাষাণ পূজা, নতুন বছরে মঙ্গল কামনায় চৈতী ও বাসন্তী পূজা, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য শীতলা পূজা প্রভৃতি খেন জনজাতি শ্রদ্ধাসহকারে আয়োজন করে থাকে। বলাবাহুল্য, মেয়েরাই এসব ব্রত-পূজার মূল কুশীলব। লৌকিক দেবীরাই তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের সাথি।

'বিষহরা' পূজার গীত

গুয়া দিল পান দিল
নাহি দিল চুন
এই কারণে মে-রে ঘরে
রাখে দিছে শুন।
শিবের ভরসা করি
না পূজিলাম বিষহরি
সেও শিব না ধরে কা-র।

হাবাংকালীর মন্ত্র

হে মা হাবাংকালী
তোর ছুরি দিয়া
এই ভক্তকে নাগান করেছু
যদি নাগান নাই লাগিবো
তাহিলে ঢেমনি কালীর মাথা খাবো।

চড়ক পূজার প্রস্তুতিকালে দেহ শুদ্ধির একটি মন্ত্র

জল ছুঁচ, ছল ছুঁচ
আরো শুদ্ধ কায়া
ফেন্নার সকল বস্ত্র
এই দেহা শুদ্ধ হইল
কৃষ্ণ নাম দিয়া।

বৃষ্টি আবাহনমূলক আচার-ক্রিয়ায় রাজবংশীদের পাশাপাশি খেনরাও অংশগ্রহণ করে সক্রিয়ভাবে। অনাবৃষ্টি ও খরা থেকে মুক্তির উদ্দেশে আয়োজন করা হয় 'জলমঙ্গলা'। পূজার দিন রাতে নিতাই ঠাকুরের থানে ধান, দুর্বা, কলা, আতপ চাল, দুধ-চিনি, তেল, সিঁদুর ও ধূপ-ধুনা সহযোগে পূজা প্রদান করা হয়। পূজার পর মাথায় জলপূর্ণ ঘট নিয়ে পাঁচ অথবা নয় জন নারী বিবস্ত্র অবস্থায় মাঠে গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানিয়ে জমিতে পানি ছিটিয়ে ফিরে আসে। 'ব্যাঙবিয়া'র মাধ্যমেও খেনদের মধ্যে বৃষ্টি আবাহনের রেয়াজ আছে। ' মেচেনী-ভেদাই খেলা' ও 'তিস্তাবুড়ির পূজা' বৃষ্টি আবাহন ও নদীর বিপদ বিতাড়নের জন্য আয়োজিত পূজানুষ্ঠান। মেচেনী খেলায় সাদা বস্ত্র পরিহিত দশ-বার জন বয়স্ক মহিলা ডালা ও কূলা নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে যায়। ডালায় থাকে ধান, দুর্বা, সিঁদুর, আতপ চাল ও পানি। ডালাটি ঢেকে রাখে একটি ছাতা দিয়ে। কোন একটি বাড়িতে গিয়ে উঠানের মাঝখানে মহিলারা অর্ধবৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তাদের সামনে পানি ঢেলে উঠান কর্দমাক্ত করা হয়। এ সময় ছোট ছোট মেয়েরা রঙিন শাড়ি পরে ঘুরে ঘুরে নাচে, বয়স্কা মহিলারা অঙভঙ্গি সহকারে গান গায়। নৃত্যগীত শেষে ডালা থেকে ঘটে ভেজানো আতপ চাল উপস্থিত দর্শকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

উপরের আচারগুলোতে সমধর্মী যাদুর ব্যবহার লক্ষণীয়। 'হুদমাদেও'-এর পূজায় অন্ধকারে বিবস্ত্র অবস্থায় মহিলাদের নৃত্যগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বৃষ্টি আবাহনের প্রক্রিয়াটি রাজবংশীদের মতো খেনদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। 'চড়কপূজা' আয়োজন করা হয় চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। এই পূজা আদিম কৌম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে সাংসারিক মঙ্গল কামনা ও বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য (মানত) খেনরা করে থাকে। এ পূজার একটি আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণির (ঘোড়া, মাছ, পাখি) মূর্তি বাঁশের কাঠি দ্বারা তৈরি ও রং দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতর প্রবেশ করে সারা গ্রাম ঢোল ও কাঁসা বাজিয়ে ঘুরে বেড়ানো। এ প্রক্রিয়ার নাম 'গমিরা'। প্রাণির মূর্তিগুলো টোটেম বিশ্বাসজাত।

খেনরা ভূমি উর্বরতা ও ফসল উৎপাদন বিষয়ে যে-সকল পূজাচার পালন করে, সেগুলো হচ্ছে গোছরপানা, মাটিসুরাই, গরুচুমা, দলছিটা, ভূঁইরাজা, ছেপুয়ান, আওনি বাওনি, লক্ষ্মীর ডাক প্রভৃতি। আবহাওয়া ও পরিবেশ বিষয়ক আচার দধিকাদো। খাদ্য ও খাবার বিষয়ক আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে বিশুয়া, জিতুয়া, সাধখিলান, পৌষাল, নবান প্রভৃতি। এগুলো রাজবংশীদের মধ্যেও প্রচলিত।

কার্তিক মাসের শেষে ক্ষেতে ধানের চারা পুরুষ্ট হয়ে উঠলে রাজবংশীদের মতো খেনরাও 'লক্ষ্মীর ডাক'-এর মাধ্যমে তাদের বাসনা জ্ঞাপন করে। রাতের বেলা কৃষক ধানক্ষেতে যায় এবং পাটকাঠির মাথায় আম বা কাঁঠালের পাতা গোল করে হলুদ, সিঁদুর, আতপ চাল প্রভৃতি রেখে এবং ধোঁয়া সহযোগে ধান ক্ষেত পরিভ্রমণ করে। এ সময় তারা উচ্চস্বরে লক্ষ্মীর নামে ডাক দেয়। পরিশেষে, জ্বলন্ত প্রদীপ আলের ওপর রেখে ফিরে যায় বাড়িতে।

একটি লক্ষ্মীর ডাক

সোরা, সোরা
ধরেয়া নেন্দুর, পকামাকড় দূর হ।
মহালক্ষ্মী খেইল খেলা
খাট নাঙ্গল, নম্বা ঈশ
হামার ধানের বড় বড় শিষ
সগার ধান আউল ঝাউল
মোর ধানত্ খালি চাউল।

এই গানে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে এবং নিজেদের ক্ষেতে অধিক ধান ফলনের কামনা ব্যক্ত হয়েছে। খেনরা বিনোদনের জন্য ভাওয়াইয়া, চটকা, খন গান, কুষাণ গান, রাবণ গান, হালুয়া-হালুয়ানীর গান, অম্বলশোরী, তিস্তাবুড়ির গান, বন্ধু পাঁচালি, নটুয়া গান, চোরচুন্নি, সত্যপীর-সত্যনারায়ণ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক গান পরিবেশন ও উপভোগ করে। দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী পূজার সময় মাসাধিক কাল ব্যাপী ধাম গানের আয়োজন করা হয়। এ সময় ধামে (বিশেষ মঞ্চ) বিভিন্ন গানের দল পালা করে কাহিনীমূলক নৃত্য-নাট্য-গীত পরিবেশন করে। খেনদের কুষান গান এতদঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। উল্লেখ্য, কুষাণ গানের উৎস রামায়ণের কাহিনী হলেও বর্তমানে সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রসালো কাহিনী পরিবেশন করা হয়। খেনদের সমাজে অন্যান্য ধর্ম ভিত্তিক গানেরও সামাজিকীকরণ লক্ষ্য করা যায়।

তথ্যনির্দেশ:

১. উদ্ধৃত, সমর পাল, উত্তর জনপদে লোকসংস্কৃতির আঙিনায়, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-৯০
২. ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান : রংপুরের ইতিহাস, গতিধারা, ঢাকা, ২০১২, পৃ-৫৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫
৪. Sujan Barman : Pragjyotisha Emperor Bhagadatta : Antiquity, History and Rajbanshi Ethnicity, Vol-2, Editor in Chief-Prof. Binay Barman, ছায়া পাবলিকেশনস, কলকাতা, ২০১২, পৃ-১০৭
৫. Martin: History, Antiquities and Topography of Eastern India, Vol-5, Reprint, Cosmo Publications, New Delhi, ১৯৭৬, পৃ-৪০৯
৬. Ibid, P-409
৭. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার রংপুর : প্রধান সম্পাদক, নূরুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ-৬৫
৮. রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম অঞ্চলের ফুলবাড়ি উপজেলার (কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার বিপরীত অঞ্চল) অনন্তপুর (খেনপাড়া) গ্রামে গৃহীত সাক্ষাৎকার। J A Vas Zvui Eastern Bengal and Assam District Gayetteer. Rangpur এ উল্লেখ করেন যে, রংপুর জেলার খেনদের অর্ধেক সংখ্যকের বাস ছিল কুড়িগ্রাম মহকুমায় (অষষধযধনধফ, ১৯১১, পৃ-৪৬)
৯. সমর পাল, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯
১০. উদ্ধৃত, সমর পাল, প্রাগুক্ত, পৃ-৯০-৯১
১১. Martin: Ibid, পৃ-৪০৮
১২. উদ্ধৃত, সমর পাল, প্রাগৃক্ত, পৃ-৯১
১৩. কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর গ্রামের খেন জাতীয় স্কুল শিক্ষক খগেন্দ্রনাথ সরকার এবং সমাজকর্মী ধীরেন্দ্রনাথ সেন প্রদত্ত পরিসংখ্যান। আমরা এ তথ্য গ্রহণ করেছি।
১৪. তাপসকুমার বন্দোপাধ্যায় : কোচ ও টোটোদের সমাজ সংস্কৃতি, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১৭
১৫. রতন বিশ্বাস : (সম্পাদক) উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১, পৃ-২৯৯
১৬. অতুল সুর : ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ: ৫৪-৫৫
১৭. নাজমুল হক : উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-৩৭
১৮. রতন বিশ্বাস : প্রাগুক্ত, পৃ:১৫৭-১৬২
১৯. ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল : (অনুবাদক) ক্যাম্বেলের চোখে কোচবিহার, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-১৯
২০. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার রংপুর, প্রাগুক্ত, পৃ-২৭
২১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩০
২২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩০

২৩. Bangladesh District Gayetteers Rangpur : Editor: Nurul Islam Khan, Bangladesh Government Press, Dacca, ১৯৭৭, পৃ-৩৮

২৪. Martin : Ibid, PP : ৪০৮-৪০৯

২৫. বিশ্বনাথ দাস : (সম্পাদিত) উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ-১১৪

২৬. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, রংপুর, প্রাগুক্ত, পৃ-৩০

২৭. বিশ্বনাথ দাস : প্রাগুক্ত, পৃ-১১০

২৮. Martin : lbid, P- 409

২৯. বিশ্বনাথ দাস প্রাগুক্ত, পৃ : ১০৯-১১৪

৩০. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার রংপুর, প্রাগুক্ত, পৃ : ৩০-৩১

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ-৩১

৩২. ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান : প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫

৩৩. Martin : lbid, P. 410

৩৪. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার রংপুর, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫৩

৩৫. Martin : lbid, P. 410-411

৩৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা, ১৩৮০,পৃ-৭৫

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫

৩৮. ৫ জুলাই ২০১৩ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন খেন জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অনন্তপুর, খেনপাড়া, কাশীপুর অঞ্চলে ফিল্ড ওয়ার্ক করা হয় (কোয়েশ্চেনিয়ার, সাক্ষাৎকার ও অবজারভেশন পদ্ধতিতে)। সাক্ষাৎকারে সকল বয়সী শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনরা অংশগ্রহণ করেন। সেকেন্ডারি তথ্য হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশ প্রকাশিত প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৯. শতাংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইনডিকেটর হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মোট জনসংখ্যা (২০ হাজার) কে।